APR. 19 2002

দৈনিক ইত্তেফাক

পৃষ্ঠা ... কলাম ...

মাতৃভাষার গৌরব

❑ মোহাম্মদ আব্দুল আউয়াল ❑

বাঙলা ভাষার জন্ম হয়েছিল কবে সে কথা আজ ঐতিহাসিকদের গবেষণার বিষয়বস্তু। বাংলাদেশ এই ভূখণ্ডের জন্ম কবে তা-ও অনুমান সাপেক্ষ। বাংলাদেশের মানুষের এই ভাষায় কখন থেকে কথা বলতো বাঙলা ভাষার তার দিন-তারিখ নির্ণয় করা সত্যি সত্যি এক দুরূহ ব্যাপার। তবে বাঙলা ভাষার উৎপত্তি যে ভারতীয় আর্য ভাষা থেকে সে সম্পর্কে সব পণ্ডিতই একমত। আর ঐ ভারতীয় আর্য ভাষার প্রাচীনতম লিখিত নিদর্শন স্বাক্ষর কালেদের ভাষায়। সংস্কৃতেই আদ্য আর্যভাষার প্রাচীনতম রূপ-এর রচনাকাল হচ্ছে খ্রীষ্টপূর্ব ১২০০ অব্দের কাছাকাছি কোন এক সময়ে। এরপরে পণ্ডিতদের মতামত প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার সাহিত্যিক বা সাধুরূপ তিন দুটি-একটি প্রাচীন-এতে রচিত হয়েছিল ধর্ম সাহিত্য-অপঢ়ি শিক্ষিত ব্যক্তির ব্যবহারের ভাষা বা কথ্য ভাষা। এই ভাষাটিই নাম দেওয়া হয় সংস্কৃত-এই সংস্কৃত ভাষারই ব্যবহার রচনা হলেন-পাণিনি। তবে এই সংস্কৃত ভাষাটি কিন্তু আসলে আসাধ্য চলন ধারণের কথ্য ভাষা ছিল না। বৈদিক ভাষা (মন্ত্রবেদ) যেমন সাহিত্যের ভাষা ছিল তেমনি সংস্কৃতও সাহিত্যের ভাষা ছিল।

ভারতীয় আর্য ভাষার দুটি রূপ-একটি কথ্য অপরটি সাহিত্যিক ভাষা। এই কথ্য ভাষারই পাঁচটি শাখা (অঞ্চল ভেদে) একটি হচ্ছে প্রাচ্য অপর শাখাগুলি হচ্ছে- উদীচ্য, প্রতীচ্য, মধ্যদেশীয়, দাক্ষিণাত্য। প্রাচ্য শাখার অন্তর্গত অর্ধমাগধী ও মাগধী। এই মাগধী থেকেই (অপভ্রংশের মধ্যদিয়ে) জন্ম হয়েছিল পূর্ব ভারতীয় ভাষাসমূহ। এগুলি হচ্ছে-ভোজপুরিয়া, মাগধী, মৈথিলী, উড়িয়া বাঙ্গলা, আসামী। এই ভাষাসমূহের জন্মকাল নির্ণয় কষ্টকর এইজন্য যে এইসব ভাষার লিখিত রূপের নিদর্শন (প্রাচীন) পাওয়া যায় না। বাঙ্গলা ভাষার যে প্রাচীনতম লিখিত রূপ পাওয়া গেছে-তা হচ্ছে চর্যাপদ। চর্যাপদের রচনাকাল-যদি সপ্ত শতাব্দীতে হয় তবে এ ভাষার জন্ম নিশ্চয়ই সপ্তম শতাব্দীর পূর্বেই হয়েছিল-কিন্তু তা কবে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় না চতুর্থ শতকে। না কি খ্রীষ্টের জন্মেরও পূর্বে। একথা জোর দেওয়া হচ্ছে না সঙ্গত কারণেই। কোন না কোন লিখিত রূপ পাওয়া যাচ্ছে না বলে। চর্যাপদগুলি রচনা করেছিলেন-সহজিয়া বৌদ্ধাচার্যগণ। নানাগ্রন্থে আছে সিদ্ধাচার্যগণের সংখ্যা হচ্ছে চুরাশিজন। তাসাত্ত্বিকদের মতে এই চুরাশি জন সিদ্ধাচার্যগণের মধ্যে অনেক কাহ্নাই ছিলেন। তাদের মধ্যে প্রধান হচ্ছেন-মীননাথ (মৎস্যেন্দ্র নাথ), কাহ্নপাদ (কানুপা) লুইপাদ, বিরূপাপাদ, ধর্মপাদ, সরহপাদ ইত্যাদি। এদের সময়কাল নিয়েও পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তাঁর শহীদুল্লাহ প্রমুখ কয়েকজন ভাষাতাত্ত্বিক বলেছেন মীননাথ সপ্তম শতাব্দীর লোক। ফরাসী পণ্ডিত সিলভাঁ লেভীর বরাত দিয়ে শহীদুল্লাহ বলেন, মীননাথ ৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দে নেপালের রাজা নরদেব নেবের সময় সেখানে গিয়েছিলেন। অবশ্য হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (পরবর্তী অনেকে) এ মত স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে চর্যাপদসমূহ নবম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে রচিত।

চর্যাপদের সঠিক রচনাকাল নির্ণয়ে নানা জটিলতার মধ্যে না বিতর্কের মধ্যে না গিয়ে আমরা বিনা দ্বিধায় বলতে পারি যে বাঙ্গলা ভাষার প্রাচীনতম রূপ আছে-চর্যাপদে। মাননীয় শহীদুল্লাহ বলেছেন, চর্যাপদগুলি বাঙ্গলা সংস্কৃতচালন প্রসূত তুলেছিলেন-এই চর্যাপদগুলি বাঙ্গলা ভাষার প্রাচীন রূপ নয় এ হচ্ছে উড়িয়া বা মৈথিলী বা হিন্দীর প্রাচীন রূপ। তবে একটি বিষয়ের প্রতি আমরা লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারি যে যেহেতু পূর্ব ভারতীয় বিভিন্ন ভাষাগুলি একই প্রাকৃত ভাষা (প্রাচ্য) থেকেই উদ্ভূত কাজেই শব্দ ব্যবহারে বা ব্যাকরণের কোন কোন ক্ষেত্রে এইসব ভাষার মধ্যে মিল থাকতে পারে।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালের রাজদরবারের গ্রন্থাগার থেকে এই চর্যাপদগুলি উদ্ধার করেন। প্রশ্ন তাহলে এর বাঙ্গলা সাহিত্যের এইসব নিদর্শন বাংলাদেশে কোন অঞ্চলে পাওয়া গেল না কেন? তার একটি ঐতিহাসিক কারণ তো নিশ্চয়ই আছে-হিন্দু (ব্রাহ্মণ) শাসনের পূর্বে বাঙ্গলাদেশ যারা শাসন করেছিল তারা সকাই ছিল বৌদ্ধ। এরপ অনুমানের দৃষ্টি ফেরাতে হবে বাঙ্গলার রাজনৈতিক ইতিহাসের দিকে। খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণের পূর্ব পর্যন্ত বাঙ্গলার অনার্য অধিবাসীরা আর্যদের রাজনৈতিক ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক প্রভাবের স্বীকার করে নি। পাটলীপুত্রে মৌর্য বংশের প্রতিষ্ঠার পরই বাঙ্গলায় আর্যপ্রভাব দেখা হয়। গুপ্ত রাজবংশের স্বর্ণযুগে ছিল বাঙ্গলাদেশ চতুর্থ পঞ্চম ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত। হর্ষবর্ধনের সময়ই আবির্ভাব হয় শশাঙ্কের এবং শশাঙ্কই কর্ণসুবর্ণ (মুর্শিদাবাদ সংলগ্ন) রাজধানী স্থাপন করেন। সে সময় থেকেই স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয় বাঙ্গলাদেশ। পূর্ববঙ্গ অবশ্য তাঁর রাজ্য বিভুক্ত ছিল।

শশাঙ্কের মৃত্যুর পরে দেশে দেখা দেয় বিশৃঙ্খলা। হর্ষবর্ধন ও কামরূপ (আসাম) রাজ আক্রমণ, একাদ্ধ শশাঙ্কের রাজ্যকে খণ্ড-বিখণ্ড করে ফেলে। তখন দেশে সুশাসন ছিল না- সর্বত্র ছিল অশান্তি অরাজকতা। তখন জনগণের মধ্যে নেতৃত্বের কর্তৃত্বের মধ্যে একটি চেতনার জন্ম নেয়-তারা একজনকে দেশের শাসনকর্তা নির্বাচিত করেন। তিনি হলেন গোপাল। ৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে গোপাল বাঙ্গলার শাসনভার গ্রহণ করেন। প্রতিষ্ঠিত হলো পাল রাজ বংশ। পাল বংশের সবাই ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। এই পাল বংশের রাজারা চার শত বৎসরের বেশী সময় ধরে বাঙ্গলাদেশ শাসন করেছিল।

তারপর পাল বংশের পতন হয়। ইতিহাসের ধারা বোধ হয় এই রকমই। তারা দেশ থেকে বিতাড়িত হলো। বাঙ্গলায় তখন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আধিপত্য। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ, পণ্ডিত ব্যক্তিগণ অনেকেই তখন দেশত্যাগী হলেন। সিদ্ধাচার্যগণ তাঁদের পুঁথিপত্র নিয়ে তাঙ্গবলাভার্থ নেপালে আশ্রয় গ্রহণ করেন। পাল বংশের পর এসেছিল সেন বংশীয় রাজা বিজয় সেন-লক্ষণ সেন।

সেন বংশীয় রাজত্বের আমলে বাঙ্গলা ভাষায় তেমন সাহিত্য সৃষ্টি হয়নি। ধর্মীয় সাহিত্য তো হয়নি। সংস্কৃত ভিন্ন অন্য ভাষায় মানুষকে (জনসাধারণকে) দেব কথা ধর্ম কথা শোনানো পাপ- তাই ব্রাহ্মণরা ঘোষণা দিয়েছিল-

"অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্যাচরিতানি চ। ভাষয়া মানবঃ শ্রুত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ"

সুতরাং জনগণের ভাষায় (বাঙ্গলা ভাষা) রাম কাহিনী বলা যাবে না- যদি কেহ সেই চেষ্টা করে তবে তার স্থান হবে রৌরব নরকে। যা কিছু সাহিত্য-তা ধর্মকথা- দেব কথা হোক-বা নীতি কথা হোক বা মানুষের কথা হোক তা হয়েছে সংস্কৃত ভাষায়। ব্রাহ্মণ্যবাদের অত্যাচারে নির্যাতিত মানুষ- নিপীড়িত জনগণ মুক্তির জন্য লালায়িত ছিল। সে যুগের দরিদ্রা সে যুগের ব্রাহ্মণ্যবাদের বিশেষণে জনগণের দুর্দশার চিত্র পাওয়া যায়- পরবর্তীকালের রচনা [সংকলন গ্রন্থ] সদুক্তি কর্ণামৃতে। বাঙ্গালী কবিই লিখেছিলেন (সংস্কৃত ভাষায়) সদুক্তি কর্ণামৃতের সংকলক শ্রী ধর দাস।

বৈরং পাদে সম বুদ্ধয়ো জন্য ইন্দু নীলাম্বরঃ বিভ্রতী
কুণ্ডং মন্ত্রমু বৃদ্ধি বেদ্য শিত্ত বিভ্রেত্তুং সমভার্বিতা
দীনন্দ্রায় বৃদ্ধিনী পরিমলদ বাস্তায় দৌতনম
গোকং তত্ত্ব মনকং দিন শতঃ নেতৃং সমা কাঙ্ক্ষতি।

বৈরাগ্যে তার সমুদ্রে সৈ, দীর্ঘ-পরিধানে ছিন্নের ক্ষুধায় শিয়ালের ঘোর কোটরাগ্রে পেট সম গিয়েছে-তারা অনুকলভাবে খালা চাইছে দীন দুঃস্থ পুরিন চোখের পানিতে দুঃখ ভাসিয়ে প্রার্থনা করছেন- এক মন চাহে যেন তাদের একদা দিন চলতে পারে।

বাঙ্গলীর জীর্ণপুরের বর্ণন আছে-

চলং কাহিং পলং কৃত্তা মুক্তন তৃণ সকরন,
গচ্ছ পলর্থি মুক্তকার্যণ জীর্ণং গ্রহং মম।

অর্থাৎ কাঠের খুটি নড়ছে মাটির দেয়াল গলে পড়ছে-চালের খড় উড়ে যাচ্ছে কেউচার সন্ধানে নিজে বাড়ে আমার জীর্ণ গৃহে পাখিগণ।

দরিদ্রতার ছবি অবশ্য চর্যাপদেও আছে। তবে শেষের দিকে রচিত চর্যাপদে। ততদিনে পাল বংশের রাজত্বের অবসান বৌদ্ধদের উপর অত্যাচার সুরু। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অভ্যুত্থান হয়েছে-দেশে রাজনৈতিক পরিবর্তন সংঘটিত হয়ে গেছে দেশের সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থারও পরিবর্তন হয়ে গেছে। লক্ষণীয় বিষয় লক্ষণ সেনের কালেই বাঙ্গলাদেশে মুসলিম শাসকদের আগমন ঘটে। বাংলাদেশ জয় করে নিলো বখতিয়ার খিলজী (১২০৩ খ্রীঃ) আর সেন বংশীয়দের পতন ঘটে। কিন্তু এক রাজশক্তির পতন আর এক নূতন রাজশক্তির অবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু দেশে সাহিত্য সৃষ্টির অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয় না। এর জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছিল দীর্ঘদিন। তবে এই সময়ে যে সামান্য সাহিত্যিক নিদর্শন পাওয়া গেছে তা হচ্ছে দোহাকোষ মিশ্রের সেক শুভোদয়। এটি প্রাচীন বাঙ্গলা ভাষারই লিখিত (যদিও অবহট্টে মিশ্রিত)। তবে এটা কোন ধর্মীয় গ্রন্থ বা দেব কাহিনী নয়। এটি রচিত হয় মুসলিম আগমনের পর পরই। সে সময়ের অন্যান্য সাহিত্যিক নিদর্শন হচ্ছে জয়দেবের গীত গোবিন্দ। এটি রাধাকৃষ্ণের কাহিনী। জয়দেবও বাঙালী কিন্তু তিনিও লিখলেন সংস্কৃতে। এমনি করে আমরা দেখি চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যকাল পর্যন্ত বাঙ্গলা ভাষার সাহিত্যের নিদর্শন নেই বললেই চলে, চতুর্দশ শতক কিংবা পঞ্চদশ শতকের প্রথমদিকে আমরা পাই-শ্রী কৃষ্ণকীর্তন, ইউসুফ-জোলেখা, কৃত্তিবাসী রামায়ণ (সংস্কৃত থেকে অনুবাদ) তারও পরে পাই মনসা বিজয়- মনসা কাব্য এবং রামায়ণ মহাভারতের অনুবাদ; আর বৈষ্ণব কবিদের অমর পদাবলী।

উল্লেখযোগ্য যে মুসলিম শাসকবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় বাঙ্গলা ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব হয় সেকালে। মুসলমান কবিগণ কিন্তু এদেশের বিষয়বস্তু অবলম্বনে সাহিত্য রচনায় ব্রতী হন এবং তারা ইসলামী বিষয় বা ভাবধারা-ফারসী সাহিত্যের অনেক উপাদান নিয়েও বাঙ্গলা ভাষায় সাহিত্যচর্চা করতে থাকেন।

তবে এ দেশীয় ভাষা বা বাঙ্গলা ভাষার গৌরবে বা গুরুত্ব সম্পর্কে মুসলমান কবিগণই প্রথম ঘোষণা দিয়েছিলেন-সৈয়দ সুলতানই প্রথম কবি (১৫৫০-১৬৬০ খ্রীঃ) যিনি বাঙ্গলা ভাষা দেশী ভাষা বা কথা -তার গৌরবের কথা উচ্চারণ করেন-দেশী ভাষা অর্থাৎ বাঙ্গলা ভাষায় সৈয়দ সুলতানের পূর্বে সাহিত্য রচনা করেছিলেন শাহ মুহম্মদ সগীর। তাঁর ইউসুফ-জোলেখা কাব্য তার প্রমাণ। সৈয়দ সুলতান তাঁর নবী-ই-বিরাজ গ্রন্থে লিখেন:

কোন সমুদ্রের কথা কেহ না বোঝয়
দেশী ভাষে এই কথা কেহ নবহিল
আরবী ফার্সি ভাষে কিতাব বহুত
অর্থ বিনাশ বুঝে ন বুঝে মূর্খ সুত।

তারপরের কবি আব্দুল হাকিম (১৬২০-১৬৯০) বাঙ্গলা ভাষার যথার্থ গৌরব বুঝবার জন্য বলিষ্ঠ ভাষায় উচ্চারণ করেন-

যে সবে বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী
সে সব কায়ের জন্ম নির্ফল জানি।
দেশী ভাষা বিদ্যা যার মনে ন যুয়ায়-
নিজ দেশ ত্যাগী কেন বিদেশে ন যায়।

(নূর নামা)

বাঙ্গলা ভাষার পূর্ণ মর্যাদা পেতে আমাদের দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে হয়েছে। ব্রাহ্মণ্য আধিপত্যের প্রোক্ষাপটে পড়ে কিন্তু আমলে বাঙ্গলা ভাষার মর্যাদা ছিল না বললেই হয়। মুসলিম আমলে অবস্থার পরিবর্তন হলো অর্থাৎ সে সময়েই হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মকাহিনী দেব-দেবীর কাহিনী বাঙ্গলা ভাষায় প্রচারিত হতে থাকে। মুসলিম শাসকবৃন্দের উদার মনোভাবের জন্যই এটা সম্ভব হয়েছিল। তবে মুসলমান সমাজের কেউ কেউ যে বাঙ্গলা ভাষায় ধর্মবিষয়ক গ্রন্থ রচনা পছন্দ করতেন না-তা সৈয়দ সুলতান আব্দুল হাকিমের বক্তব্য থেকে তা সুস্পষ্ট।

মুসলিম শাসনের অবসানের পর ইংরেজ আমলেও আমরা দেখি বাঙ্গলা ও সাহিত্য রাষ্ট্রীয় কোন পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেনি। তবে ইংরেজ আমলে রাজকর্মচারী (ইংরেজ)দের বাঙ্গলা (ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষা) শিখবার জন্য কলিকাতায় (তৎকালীন রাজধানী) ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ (১৮০০) স্থাপন করা হয়েছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল রাজকার্যের সহায়তার জন্য দেশীয় ভাষা শিক্ষা লাভ। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের তাই বাঙ্গলা ভাষায় কতগুলি পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়েছিল।

সেকালে সাহিত্য সৃষ্টি যা হয়েছে তা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত বা সামাজিক পৃষ্ঠপোষকতায় অবশ্য সেকালেও হিন্দু মুসলমানের সাহিত্য চর্চা ঠিক একই ধারায় চলছিল না। মুসলমান লেখকগণ আরবী ফারসী (উর্দু) মিশ্রিত বাঙ্গলার দিকে ঝুঁকে পড়লো। এভাবে দোভাষী পুঁথির সৃষ্টি হয়েছিল উনবিংশ শতকেও। যদিও আঠারশ শতকেই দোভাষী পুঁথির উন্মেষকাল। আর অপরদিকে প্রতিবেশী শিক্ষিত হিন্দু সমাজ পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ করে পাশ্চাত্য সাহিত্যের অনুকরণে আধুনিক সাহিত্যের দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হচ্ছিল। তবে এই শিক্ষিত হিন্দু সমাজের লেখকেরা সংস্কৃতবহুল বাঙ্গলায় তাদের সাহিত্য সৃষ্টি করেছিলেন-তাও সত্য। তবে কবিওয়ালাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার-মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রচারে সোচ্চার ছিলেন-তাও ঠিক। এদের মধ্যে রামনিধি গুপ্ত বা নিধু বাবুর নাম সবিশেষ উল্লেখ করা যায়।

নানান দেশে নানান ভাষা
বিনে স্বদেশী ভাষে পুরে কি আশা
কত নদী সরোবর কিবা হয় চাতকীর
ধারা জল বিনে কভু ঘুচে কি তৃষা।

ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় আছে:

বৃদ্ধ কাল মাতৃভাষা পূরাও তাহার আশা
দেশে কর বিদ্যা বিতরণ।

প্রথমজীবনে ইংরেজীতে কাব্য রচনা শুরু করে পরবর্তীকালে (সংস্কৃতবহুল) বাঙ্গলা ভাষায় সাহিত্য রচনায় নিয়োজিত মাইকেল মধুসূদন দত্তের.....অমেঘশক্তি-

হে বঙ্গ ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন
তা সবে অবোধ আমি অবহেলা করি
পর ধন লোভে মত্ত করিনু ভ্রমণ
.....মাতৃভাষা রতনের রাজি
এ ভিখারী দশা তবে কেন হেথা আজি-
পালিলাম আত্মা সুখে; পাইলাম কালে
মাতৃভাষা রূপ-খনি পূর্ণ মণিজালে।

উনিশ শতকের প্রথমদিকে (১৮২৯ খ্রীঃ) ইংরেজ সরকার ভারতের কোর্ট কাচারির ভাষা হিসাবে এতকাল ব্যবহৃত ফারসী ভাষার পরিবর্তে ইংরেজীর প্রবর্তন করেন। রাজভাষা ইংরেজী হওয়াতে দেশে ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন হলো-কেননা ইংরেজী ভাষা না জানলে না শিখলে সরকারী কাজ-কর্ম চাকরি বাকরি কিছুই পাওয়া যাবে না। কিন্তু মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে ইংরেজী ভাষা শিক্ষার প্রতি প্রবল অনীহা দেখা গেল। ফলে অর্থনৈতিক দিক থেকে বা পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষায় মুসলিম সমাজ হিন্দু সম্প্রদায়ের তুলনায় অনেক পশ্চাতে পড়ে রইল।

তবে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, মাতৃভাষার চর্চার ক্ষেত্রে বাঙ্গালী মুসলমানগণ পশ্চাৎপদ ছিল না। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে (বা অপরার্ধে) বেশ কয়েকজন খাতিমান মুসলমান লেখকের আবির্ভাব সে কথার প্রমাণ বা সাক্ষ্য বহন করে। মীর মশাররফ হোসেন উনিশ শতকের লেখকদের এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছেন। তিনি তাঁর গ্রন্থ 'বিষাদ সিন্ধু' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে (উদ্ধার পর্বের চতুর্থ প্রবাহে) লিখেছেন:

"বিষাদ সিন্ধুর প্রথম ভাগেই স্বজাতীয় মূর্খদল হাড়ে হাড়ে চটিয়া রহিয়াছেন-অপরাধ তার কিছুই নহে পয়গম্বর এবং এমামদিগের নামের পূর্বে বাঙ্গলা ভাষায় ব্যবহার্য শব্দে সম্বোধন করা হইয়াছে। মহাপাপের কার্যই করিয়াছি.....।"

বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় ইংরেজরা এদেশের শাসনভার পরিত্যাগ করে চলে গেলে ভারত একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়। পাকিস্তান ভূখণ্ডের সঙ্গে পূর্ববঙ্গ অন্তর্ভুক্ত হয়ে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে (১৯৪৭) পরিণত হয়। স্বাধীনতার পর বাঙ্গলা ভাষায় রাষ্ট্রীয় কার্যকর্ম পরিচালনার কোন উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। যদিও বাঙ্গলা ভাষীর জনসংখ্যা পাকিস্তানে ছিল শতকরা চারশত জন। যদিও বাঙ্গালীরা এই ভাষার দাবী জানিয়েছিল কিন্তু তা গুরুত্ব পায়নি। সেজন্যই বায়ান্ন সালে (১৯৫২) রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের জন্ম হয়েছিল। বাঙ্গলাভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা স্বীকার করা হোক। এই আন্দোলনের কেন্দ্র করেই পূর্ব বাঙ্গলার মানুষের অর্থনৈতিক আন্দোলনেরও জন্ম দেয়। প্রথম আন্দোলনের ফলে কেন্দ্রীয় সরকার কায়দে-আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ বাঙ্গলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দিল-কিন্তু বাস্তবে কোন পদক্ষেপই নেওয়া হয়নি। কেননা কেন্দ্রীয় সরকারের প্রায় সম্পূর্ণ অংশটাই পশ্চিম পাকিস্তানীদের কর্তৃত্বে নিয়ন্ত্রিত হতো। পূর্ব বাঙ্গলার মানুষ অবিলম্বে বুঝতে পারে যে আরও সংগ্রাম ও আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে-নইলে কিছুই অর্জন করা যাবে না। বাঙ্গলীর মনে তখন স্বায়ত্তশাসন, আঞ্চলিকতাবাদ, এইসব বিষয়গুলি ক্রমশঃ প্রাধান্য পেতে থাকে।

এমনি আন্দোলনে কেটে গেল দীর্ঘদিন-বায়ান্ন থেকে সত্তর-একাত্তর। একাত্তর সালে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় হলো। মাতৃভাষার অধিকার বা পূর্ণ মর্যাদার পথে আর তো কোন অন্তরায় রইল না। এরপরও কেটে গেল তিরিশ বছর নানা বিপর্যয় বিশৃঙ্খলা আর বিভাগ বিভেদের মধ্যদিয়ে।

শিক্ষার বাহন হিসাবে (শুধু মাধ্যমিক নয় উচ্চশিক্ষা-স্নাতক স্তরের প্রযুক্তিবিদ্যাসহ) বাঙ্গলা ভাষার ব্যবহার কতটা হয়েছে তা পর্যালোচনার সময় এসেছে-সরকারী প্রশাসনে কতটা সফল হয়েছে তা দেখার দিন এসেছে-বেসরকারী বাজারে (ব্যবসা-বাণিজ্য) ভারতীয়-বৈদেশিক) বাঙ্গলা ভাষার কতটা ব্যবহার করা হচ্ছে তা কি পর্যালোচনার সময় আসেনি? আমরা বাঙ্গলা ভাষার প্রয়োগে কতটা সফল, কতটা ব্যর্থ তা দেখার দিন কি এখনো আসেনি। এখনো কি আমরা নানা পদ্ধতির মাধ্যমিক অগ্রসর হবো? শিক্ষা ব্যবস্থার দিকে তাকালে কি দেখি-মাতৃভাষার সঙ্গে সঙ্গে একেবারে প্রথম শ্রেণী থেকেই পাঁচ ছয় বছরের শিশুকে বিদেশী ভাষা শিক্ষাকে-বাধ্যতামূলকভাবে; পাঁচ বছরের শিশুকে মাতৃভাষার সঙ্গে সঙ্গে দুটি বিদেশী ভাষা শিখানোর কি যৌক্তিকতা তা কি আমাদের রাষ্ট্রনায়কদের-সমাজপতিরা-চিন্তাবীরা ব্যক্তিগত ভেবে দেখেছেন, এসব চিন্তা-ভাবনার দিন কিন্তু অতীতের দুয়ারে সমাগত নইলে আমরা কিন্তু জাতি হিসাবে বহুর পিছিয়ে পড়বো।

মাতৃভাষার অধিকার রক্ষার জন্য যে সংগ্রাম শুরু হয়েছিল একদিন তা যেন বিফলে না যায়। মাতৃভাষার গৌরবের কথা-মাতৃভাষার সাহায্যে উচ্চতর শিক্ষা লাভের কথাটা যেন আমরা পৃথিবীর সভ্য জাতির কাছ থেকে গ্রহণ করতে পারি। এশিয়ার সবচাইতে উন্নত দেশ জাপান মাতৃভাষার সাহায্যেই তাদের সকল স্তরের শিক্ষা গ্রহণ করেই আজ পৃথিবীর অন্যতম উন্নত রাষ্ট্র হিসাবে পরিচিত। ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ কি আমাদের কোনভাবেই সম্ভব হবে না। না আমাদের ইচ্ছাই হয় না ইতিহাসের কাছ থেকে শিক্ষা নিতে। ইতিহাস-অচেতন জাতি হিসাবে কি আমরা চিরকালই চিহ্নিত হয়ে থাকতে চাই। ❑